উত্তরবঙ্গের লোকমেলা

তানজিদা আক্তার*

[সারসংক্ষেপ : সভ্যতার আদি যুগে নদীর তীর বা মোহনায় এবং পাহাড়-পর্বতের উপত্যকায় জাগতিক প্রয়োজনে বসতো মানুষের মিলনমেলা। ধীরে ধীরে মেলায় যোগ হতে থাকে নতুন নতুন অনুষঙ্গ– পালাগান, যাত্রা, কবিগান, জারি, বাজিকরের খেলা, বায়োস্কোপ, নাগরদোলা ইত্যাদি। সম্প্রতি ঐতিহ্যগত রূপের পরিবর্তন এবং আয়োজনের দীনতার ফলে মেলার পূর্বের আবেদন অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলো রূপ বদলের পরেও টিকে আছে। এর প্রমাণ বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের মেলাসমূহ। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত মেলা আয়োজিত হয়। তবে এগুলোর আয়োজন ও উদ্‌যাপন লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা মেলাগুলোর অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে বিস্তর রূপান্তর সাধিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের মেলাসমূহের রূপ আর রূপান্তরের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে।]

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে মিলনের যে আয়োজন, তা থেকেই মেলা শব্দটির উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। আদিম যুগে অরণ্যচারী মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করতো, অরণ্য থেকে ফলমূল সংগ্রহ করতো, বন্যপ্রাণী ধরে আনতো পাহাড়-পর্বত বা অরণ্য থেকে। ভোগের অতিরিক্ত সামগ্রী নিয়ে তারা কোনো নদীর ধারে, পাহাড়ি উপত্যকায় বা বৃহৎ কোনো বৃক্ষ ছায়ায় সাজিয়ে রাখতো। অধিবাসীরা বদলক্রয়ের মাধ্যমে একে অন্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি বেছে নিতো। কৃষিব্যবস্থার উদ্ভাবনের পর থেকে শুরু হলো ফসল- বা শস্য-বিনিময়। আবার পোশাক, তৈজসপত্র, হাতিয়ার সহ উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির দ্রব্যাদিরও বিনিময় হতো এই মেলাসমূহে। কালপরিক্রমায় মানুষের বিনোদনের প্রয়োজনেই হয়তো যুক্ত হয়েছে নৃত্যগীত সহ উৎসবের নানা অনুষঙ্গ। এর ধারাবাহিকতায় মেলা হয়ে উঠেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনস্থল।

কবে কখন মেলার শুরু, তা দিন তারিখ দিয়ে বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় মানুষ যখন যূথবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলেছে, তখন থেকেই মেলার শুরু। সভ্যতার আদি যুগে নদীর তীর বা মোহনায় এবং পাহাড়-পর্বতের উপত্যকায় জাগতিক প্রয়োজনে বসতো মানুষের মিলনমেলা। ধীরে ধীরে মেলায় যোগ হতে থাকে নতুন নতুন আয়োজন– পালাগান, যাত্রা, কবিগান, জারি, বাজিকরের খেলা, বায়োস্কোপ, নাগরদোলা ইত্যাদি। মেলাকেন্দ্রিক শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ড. সুনীতকুমার মুখোপ্যাধায় বলেছেন–

> মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে পল্লীর সাধারণ মানুষ লোকশিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করে। শিল্প-সাহিত্যের ভেতর দিয়ে এই আনন্দকে প্রচার করে লোককবি, শিল্পী, গায়ক ও কথকেরা। তাই এ কথা মনে করা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে অনুষ্ঠান-নির্ভর লোকসাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে মেলা ও উৎসব পল্লীর সাধারণ লোকসমাজের কাছে সুদীর্ঘ কাল থেকে লোকমাধ্যম (Folk Media)

* প্রাবন্ধিক-গবেষক।

> হিসেবে কাজ করে চলেছে। অখ্যাত ও নিরক্ষর লোক-কবিরা তাই মেলা ও উৎসবকে মাধ্যম করে পল্লীজনপদের জনতার কাছে তাদের অফুরন্ত লোকসাহিত্যের ভান্ডারকে উন্মুক্ত করে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। সেই লোকসাহিত্যের ভান্ডার বলতে আমরা মেলা ও উৎসবানুষ্ঠান নির্ভর লোকসঙ্গীত, ছড়া-গান, পাঠ কিংবা কথা ও কাহিনীকেই বোঝাতে চাইছি। লোক-কবি ও শিল্পীরা সহজ-সরল ভাষায় গ্রাম্য ঢঙে ও বিচিত্র কলাকৌশলে সেইসব বিষয়কে নিরক্ষর মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলে। তাই মেলা ও উৎসব হল সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্ম-শিক্ষার এক যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যম (Traditional Folk Media)। (সুনীতকুমার, ১৯৯৭ : ১১৪)

বৃহত্তর উত্তর অঞ্চলের মেলাগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। এ অঞ্চলে আমরা যেসব মেলার চিত্র পাই তাতে দেখা যাবে রথযাত্রা মেলা, ঢাকের মেলা, কোনো সন্ন্যাসী বা দরবেশের স্মরণে মেলা, কোনো দেবতা বা দেবীকে নিয়ে মেলা, বাউলদের মেলা, দোলযাত্রার মেলা সহ বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু সময় ও বিষয় উপযোগী মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে চলে উৎসব। নাচ–গান, আনন্দ, যাত্রা, থিয়েটার, ঘোড়দৌড়, মোরগের লড়াই আবার কখনো কখনো সার্কাস পার্টি– এ-সবকিছুই মেলার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন একটি মেলা হচ্ছে রাজশাহীর দুর্গাপুরের আশ্বিনের মেলা। দুর্গাপুর উপজেলা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের আঁকাবাঁকা পথ। দুপাশে পানের বরজ, আম কাঁঠালের বাগান, ডোবা, ঝোপঝাড়। গ্রামের প্রবেশ মুখেই বিশালাকৃতির বটবৃক্ষ– অনেক ইতিহাস বুকে ধারণ করে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। উজাল খলসি গ্রাম এখনো অনেকটাই অনুন্নত। একসময় সম্ভ্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস ছিল সেখানে। দেশবিভাগের সময় তারা পশ্চিম বাংলায় চলে যান। গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বড়ালের শাখা নদ রায়চান। একসময়ের স্রোতস্বিনী রায়চান এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। এর তীরেই আশ্বিন মাসের শেষ দিন মেলা হয়। এ মেলার সূত্রপাত সর্ম্পকে কিছুই জানা যায় না। স্থানীয় মানুষদের হিসেবে এ মেলার বয়স হবে দু'শ বছর বা তারও বেশি। উজাল খলসির মেলার সঙ্গে রায়চান নদের গভীর সখ্য রয়েছে। একসময় এ নদে বড়ো বড়ো নৌকা চলাচল করত। সে সম্পর্কেই আছে একটা কিংবদন্তি :

> চাঁদ সওদাগরের জ্ঞাতি ধনাই সওদাগর দূর থেকে বাণিজ্য করে নৌকার বহর দুটো নিয়ে ফিরছিল। উজাল খলসি এসে ডুবে যায় দুটো নৌকা। অনেক মূল্যবান মণি মুক্তাবোঝাই নৌকাডুবিতে প্রাণ হারাল ধনাই সওদাগরের সতীর্থরা। যেখানে নৌকা ডুবেছিল ঠিক সেখানটায় পলি জমে জমে ভরাট হয়ে যায় এবং জন্ম নেয় দুটো হিজল গাছ। এখনো গাছ দুটোর কাছে ছোট পুকুরের মতো প্রায় সারা বছরই পানি থাকে। বর্ষার দুর্বিনীত পানিতে পুকুর ভেসে যায় কিন্তু হিজলগাছ ডোবে না। উজাল খলসির সাধারণ মানুষের ধারণা গাছ দুটো নৌকার ওপর জন্মেছে বলেই ডোবে না। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা মনে করেন, হিজলগাছের নিচে ধনাই সওদাগরের ধন-রত্ন পাওয়া যাবে। এই কিংবদন্তি বা প্রচলিত লোককাহিনিগুলোই এখানকার মেলার প্রাণ। (মোকারম, ২০১৪ : ৮৮)

আশ্বিনের মেলা উপলক্ষ্যে গ্রামের সব পরিবারেই দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনেরা এসে জড়ো হয়। ইদ কিংবা পূজায় কেউ আসে না। দীর্ঘদিন থেকেই এখানে এই রেওয়াজ প্রচলিত। আত্মীয়স্বজন আসবে বলে গ্রামবাসীরাও প্রস্তুত থাকে। আগত অতিথিদের সমাদর করতে হয়। সাধ্যমতো জামাকাপড় দিতে হয়। এই মেলা এক দিনের হলেও ব্যাপ্তি প্রায় ৩ দিন। মেলা উপলক্ষ্যে ৩০/৪০টি গরু জবাই হয়। সমপরিমাণ মহিষও জবাই হয়। যেখানে মেলা জমে তার আশেপাশে কোনো হাট-বাজার নেই। নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সবুজ,

খোকসার ঝোপ, বেশ কিছু আম গাছ, নারকেল ও পাকুড়গাছ, এমন একটি স্থানেই হঠাৎ আশ্বিনের শেষ দিন মানুষের ঢল নামে। আশ্বিনসংক্রান্তির মেলায় দর্শনার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে মেলার রূপ-জৌলুস। একসময় মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল 'জাগের গান'। এই গানের সুর এবং পরিবেশনা একটু ভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন স্থান থেকে আসত জাগের গানের দল। নৌকা নদীতে ভেসে বেড়াত আর শিল্পীরা নৌকার ওপর বিচিত্র পোশাক পরে খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইত আর সঙ্গে অভিনয় ও নৃত্য করত। দর্শনার্থীরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাগের গান শুনত। কেউ কেউ দুয়েকটা আধুলি ইনাম হিসেবে ছুড়ে দিত। জাগানোর গান থেকে জাগের গান শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে এই গান বানাত নিরক্ষর এক সাধু বাঙালি। 'দি নিউ আলো সার্কাস' এ মেলার প্রধান আকর্ষণ। মেলার প্রবেশপথেই থাকে বেশ কয়েকটি খেলনার দোকান, জিলাপির দোকান। এই মেলাতে জিলাপি বিক্রির পরিমাণ বিস্ময়কর। এছাড়া খইয়ের দোকান, গৃহস্থালি সামগ্রীর দোকান, মাটির হাড়ি-পাতিলের দোকান, ফেরিওয়ালাদের দোকান ঘিরে ভিড় জমে ওঠে। সার্কাসের প্যান্ডেল থেকে ভেসে আসে বিক্ষিপ্ত গানের কলি। এছাড়াও এই মেলাতে সাপুড়ে মেলা হয়। মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাপ খেলা দেখে, তাবিজ-কবজ কেনে। এভাবেই মেলার দিন পেরিয়ে যায়।



চিত্র ১ : রাজশাহীর দুর্গাপুরের আশ্বিনের মেলা

উত্তর অঞ্চলের আরেকটি ভিন্নধর্মী মেলার নাম 'তাড়াশের দই মেলা'। সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী 'দই মেলা' বৃহত্তর চলনবিলের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দই মেলাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর চলনবিলের তাড়াশ, উল্লাপাড়া, বোনাইনগর, ফরিদপুর, ভাসুরা, চাটমোহর ও গুরুদাসপুর উপজেলার লোকজনের এক মিলনমেলা বসে। স্থানীয়দের মতে দই মেলার সূত্রপাত হয় প্রায় দুইশত বছর আগে। তৎকালীন চলনবিলের জমিদার রাজাশ্বী রায় বনমালী রায়বাহাদুর তাঁর এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে তাড়াশে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। জমিদারের কর্মচারীরা সরস্বতী পূজার দিনে জমিদারের বন্ধুকে দই, মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি ও খই

দিয়ে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর তখন থেকেই সরস্বতীপূজার দিনে দই মেলার আয়োজন করা হয় এ অঞ্চলে। কারো কারো মতে, দইয়ের গুণাগুণ ও উৎকৃষ্টতার মানদণ্ডে জমিদার বনমালী রায়বাহাদুর ঘোষালদের মধ্যে পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এই সময় প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেও অনেক আত্মীয় বেড়াতে আসতেন। সিরাজগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে তাড়াশ উপজেলা সদর। উপজেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তাড়াশ প্রেসক্লাব সংলগ্ন ইদগাহ মাঠে সরস্বতী পূজার দিনে মেলাটি দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দই মেলায় বগুড়ার শেরপুর, নাটোরের গুরুদাসপুর, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া এবং পাবনা জেলার বেশ কয়েকটি উপজেলা থেকে প্রায় পাঁচ–ছয়শ ঘোষাল দই বিক্রি করতে আসে। দই মেলায় দইয়ের পাশাপাশি চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, চিনি ও গুড়ের তৈরি গজা, কদম, ক্ষীর–খাসিয়ানা, ক্ষীরসাপাতসহ, সন্দেশ, মিষ্টি, জিলাপি ও অন্যান্য সুস্বাদু খাবারও পাওয়া যায়। আগে দামে সস্তা হলেও এখন তুলনামূলক একটু বেশি। স্থানীয়দের মতে এখন আর আগের মতো দইয়ের স্বাদ পাওয়া যায় না। আগে এ দই মেলা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান ও আদিবাসীদের এক মিলন মেলা। চলনবিল অঞ্চলের স্বল্প উপার্জনকারী কৃষক বা জেলে বছরের কোনো সময়ে দই না কিনলেও দই মেলায় অল্প হলেও দই কেনেন বা আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিয়ে থাকেন।

বগুড়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মেলার নাম 'পোড়াদহের মেলা'। প্রতিবছর মাঘের শেষ বুধবার অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার ছোটো যমুনা নদীর তীরবর্তী পোড়াদহে বসে এই মাছের মেলা। এই মেলা বসে বগুড়ার গাবতলীর মহিষবাথান ইউনিয়নে। সন্ন্যাসপূজা উপলক্ষ্যে মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো বলে একসময় এই মেলার নাম ছিল 'সন্ন্যাস মেলা'।

কীভাবে এই পূজা এবং মেলার সৃষ্টি সন্ন্যাসীর পূজার সেবাইত ও সেক্রেটারি সত্তরোর্ধ্ব শ্রী গণেশ চন্দ্র পালের পুত্র অধ্যাপক ননী গোপাল পাল মেলা প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের থানে বসে সে সম্পর্কে জানালেন :

> আনুমানিক দুইশত বা আড়াই শত বছর পূর্বে স্থানীয় গাড়ীদহ নদীতে রাতে কয়েক জন মৎস্যজীবী মাছ ধরার সময় হঠাৎ তাদের জাল নদীতে আটকে যায়। পরের দিন পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও তারা জাল তুলতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় তারা হাল ছেড়ে দিয়ে যখন নদীর পাড়েই রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন এক জেলে স্বপ্নে দেখতে পান, নদীর ভেতর থেকে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর উঠে এসে তাকে বলছে 'সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো করলেই তাদের জাল উদ্ধার হবে'। ঘুম ভেঙ্গে গেলে অন্য জেলেদের একথা বলার পর স্থানীয় পালদের সাহায্যে এখানে তারা সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো করে। এরপর তাদের জাল উদ্ধার হয়। এই পুজোর দিনটি ছিল মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার। জাল উদ্ধারের কথা খুব দ্রুত চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে অনুযায়ী অনেকেই এখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মানত করে এবং পুজো দিতে আসে। এই পুজো উপলক্ষ্যেই পরদিন বুধবার মেলা বসে। (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ২৫৮)

বর্তমানে নাম বদল হলেও মেলার আচরণ বদলায়নি এখনো। মেলা উপলক্ষ্যে এ এলাকার মেয়েরা নাইয়র আসে। এই মেলাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হরেক জাতের বিশাল বিশাল মাছ। মাছের বড়ো ক্রেতা হলো জামাইরা। তারা পছন্দমতো মাছ কিনে নিয়ে যায় শ্বশুরবাড়িতে।

এটাই নিয়ম, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এই মেলার গুরুত্ব ধর্মীয় উৎসবের থেকেও বেশি।



চিত্র ২ : পোড়াদহের মাছের মেলা

উত্তর অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মেলা হলো "গোপিনাথপুর মেলা"। এটি জয়পুরহাট জেলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মেলা। মূলত দোল পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে মেলাটি জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার গোপিনাথপুর নন্দিগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি প্রায় চারশত বছরের পুরোনো একটি মেলা। জানা যায় গোপিনাথের প্রধান মন্দির থেকে ঠাকুরমূর্তি বাজার মন্দিরে স্থানান্তরিত করার মধ্য দিয়ে মেলাটি শুরু হয়। রীতি অনুযায়ী বাজার মন্দিরে ঠাকুর যতদিন থাকবে ততদিনই মেলাটি থাকবে। মেলাটি প্রায় ১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে শতাধিক একর জমির উপরে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হলো ঘোড়া। গরু, মহিষের পাশাপাশি মেলায় ঘোড়াও বেচা-কেনা হয়। বাংলাদেশের একমাত্র ঘোড়া বেচা-কেনার মেলা এটি। এই মেলাতে ঘোড়ার ক্রেতাদেরকে দেখানো হয় ঘোড়দৌড়। একসময় এই মেলাতে উট দুম্বাও বেচা বিক্রি হত। সময়ের বিবর্তনে উট দুম্বার পরিবর্তে গরু, মহিষ, ঘোড়া স্থান করে নিয়েছে। সারাদেশ থেকে নানা রকমের কয়েকহাজার ঘোড়া জড়ো করা হয় এখানে তাই এই মেলাকে ঘোড়ার মিলনমেলাও বলা যেতে পারে। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে বর্তমানে মেলাটি পুরো মাসজুড়ে আর হয় না। এটি তেরো চৌদ্দ দিন স্থায়ী হয়। মেলার প্রথম পাচঁদিন চলে গরু, মহিষ আর ঘোড়া কেনা-বেচা। প্রাণীর মেলা শেষ হওয়ার পর শুরু হয় কাঠ ও ফার্নিচারের মেলা। আশেপাশের গ্রামের মানুষেরা এই মেলা থেকে মেয়ে-জামাইয়ের জন্য ফার্নিচার কেনে। সারাবছরের জন্য মসলাপাতি, কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে রাখেন। বিশেষ করে বেঁতের ও বাঁশের তৈরি জিনিস পাওয়া যায় এই মেলায়। দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই মেলার আমেজ চলে জয়পুরহাট জেলার অন্তত তিনটি উপজেলার শতাধিক গ্রামে। যাত্রা ও সার্কাসও ছিল

এই মেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ। কিন্তু বর্তমানে সার্কাস বন্ধ হয়ে গেছে। মেলা আগের অবস্থানে না থাকলেও মেলাকেন্দ্রিক উৎসবের আমেজটা এখনো রয়েছে মানুষের মনে।




চিত্র ৩ : গোপিনাথপুর মেলার ঘোড়দৌড়

ঠাকুরগাঁওয়ের লোকমেলাগুলো নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে আসছে বেশ কিছু বছর ধরে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নেকমরদ ওরসমেলা এর মধ্যে অন্যতম মেলা।

> কথিত আছে নেকমরদ গ্রামের প্রাচীন নাম ভবানন্দপুর। এ গ্রামেই মহান সাধক হযরত পীর নাসির উদ্দিন (রঃ) মোঘল আমলের প্রথম দিকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাকে সেখানে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বৈশাখের ১ ও ২ তারিখে ওরস অনুষ্ঠিত হত। এতে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনের বিপুল সমাগম ঘটতো। এই লোকের সমাগম কালক্রমে মেলায় পরিণত হয়। পীর সাহেব পুণ্যাত্মা ছিলেন বলে শ্রদ্ধাবশত লোকে তাকে নেকবাবা বা নেকমর্দ বলেই জানতেন। তাই তার নামানুসারে উক্ত স্থানের নামকরণ হয় নেকমরদ এবং পরবর্তীকালে মেলাটিরও নামকরণ হয় নেকমরদ ওরশমেলা। (আনসারুল, ২০০৫ : ৩৯৬)

দেশি-বিদেশি বহু মানুষ আসত এই মেলায় এবং অনেক দুর্লভ দ্রব্যাদি কেনা-বেচা হতো। ভারতের পূর্ণিয়া ও আশেপাশের জেলা থেকে গরু মহিষ এবং ভেড়া আসত। আসাম, দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চল (উত্তর হিমালয়) থেকে আসত হাতি। এই হাতি কিনতেন স্থানীয় জমিদারগণ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কাশ্মির থেকে মুঘল পাঠান বংশীয় সওদাগরেরা শুকনা ফল ও কারুকার্য খচিত ঘোড়ার জিন, ধারালো ছুরি, তীক্ষ্ণ তরবারি, আয়না ইত্যাদি বহু বিলাসদ্রব্য উটের পিঠে করে মেলায় নিয়ে আসতেন। শিখেরা আনতেন হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের চিরুনি, গলার মালা ইত্যাদি। পাহাড়িরা আনতেন কাজল, গরম কাপড়, বাদাম, পনির ইত্যাদি, নেপালিরা আনতেন কুকুর ও চিরতা পাতা, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ আনতেন মুক্তার মালা, চট, রেশমী কাপড়, পাটজাত দ্রব্য ও বিখ্যাত টাঙ্গন (টাট্টু) ঘোড়া। মহামূল্যবান টাঙ্গন ঘোড়া কেনাবেচার জন্য এ মেলায় ভিড় জমতো। স্থানীয় জমিদারগণ ছাড়াও বিদেশি সৌখিন লোকেরাও পণ্য কিনতে আসতেন নেকমরদ মেলায়। পরবর্তীকালে স্থানীয় মুসলমান ও জমিদারদের দ্বন্দ্বের কারণে মেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতপর ১৯০৭ সালে মেলাটি পুনরায় চালু হয়।

নেকমরদ মেলা ছাড়াও ঠাকুরগাঁয়ে আরও বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী মেলা আছে। মেলাকে কেন্দ্র করে মেলার স্থান ও এর আশেপাশের ৪/৫ কিলোমিটার জুড়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আনন্দে মুখরিত হয়ে থাকে। এই মেলায় অবহেলিত লোকশিল্পী, মৃৎশিল্পীর তৈরি পুতুল, হাড়ি, হাতি–ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে ভরে থাকে। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ "সরীর গান" এই এলাকার

নিজস্ব স্টাইলে এই গান পরিবেশিত হয়। এই গানটি মূলত নায়িকা প্রধান– পালার নাম হয় নায়িকার নামে। নায়িকা অনেকেই অল্পবয়সি বিধবা অথবা তাদের স্বামী বয়সে প্রৌঢ় এ ধরনের নারীদের সুপ্ত পরকীয়া আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চকিত করার চেষ্ঠা করা হয়েছে। এ অর্থেই তাদেরকে "সরী" বলা হচ্ছে। অর্থাৎ একধরনের অবাধ্যতা বোঝানো হয়। এই মেলার আরও একটি আকর্ষণ হলো "দাইঘুরা গান" একসময় আউশের ধান যেমন গরু দিয়ে ঘুরে ঘুরে মাড়ানো হতো অনুরূপভাবে মাঝখানে যন্ত্রীদল ও মাস্টারকে রেখে সমস্ত কাহিনির সংলাপ ও সংগীত ঘুরে ঘুরে গাওয়া হয় বলে স্থানীয়রা একে দাইঘুরা গান বলে। সংগীত নির্ভরতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, এ পালাগুলো নায়িকা চরিত্রে এখনো রূপদান করে থাকে পুরুষেরাই। মূলত আমাদের অবহেলিত নারীজীবনের চিত্রই তুলে ধরেছে এই পালাগুলোতে। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের এই পালা গানই বেশি আকৃষ্ট করে মানুষকে।

এটি অনস্বীকার্য যে, শতবর্ষ পূর্বে বিভিন্ন মেলায় যে আদিম রূপ ছিল আজকালের মেলায় তার রূপ বদলেছে। মেলাগুলো আজ অধিকাংশই মানবতামুখী এবং ধর্মীয় ভাবের পরিবর্তে এগুলোর ব্যবসায়িক দিকটিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সমগ্র বাংলা মেলাগুলির উপর ১৯২১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মি. বেন্টসলি [Fairs and Festivals in Bengal; chas & Benaley, M. B.D.O.H.D.T.M. & H. Director of public Health, Bengal, Calcatta] একটি ২৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থ লিখেন। (আশরাফ, ১৯৯৮ : ১২৬৫)

এই গ্রন্থে বেন্টসলি সাহেব ১৯২১ সালে যে-সব মেলার বর্ণনা দিয়েছেন তার সবগুলি ঐতিহাসিক কারণেই দেশবিভাগ পরবর্তী যুগে এক অবস্থা বা এক চরিত্রে নাই। কোনো কোনো স্থলে আর মেলাই বসে না। এই পরিবর্তনের পিছনে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আর্থিক অবস্থারও যোগাযোগ থাকবে তা বলা বাহুল্য। বস্তুত আমাদের প্রবর্তিত মেলাগুলোর জন্য নির্ধারিত সময় সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ বা শরৎ-ফাল্গুন। যখন গরম কিংবা শীত কোনটাই বেশি থাকে না। মেলার উপলক্ষ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি হলেও বর্তমানে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অনেক উপলক্ষ্যেও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে যাই হোক না কেন মেলাকেন্দ্রিক চিন্তার বড়ো উপাদান হলো মানুষকে আনন্দদান করা। উত্তর অঞ্চলে মেলাগুলো অতীত ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে চলে আসলেও মেলার ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় নৌকাবাইচ আর ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে। তবে এসব সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা।

ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলো আজ আর আগের অবস্থানে নেই। নানান ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে উন্নত প্রযুক্তির কারণে মানুষের বিনোদন সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। এ কারণে মেলাগুলো পূর্বের আমেজ, আবেদন অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে– মেলাগুলোর রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। তবে ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলো রূপ বদলে হলেও টিকে আছে। সময়ের বিবর্তনে মেলাগুলোর রূপান্তরের ছবি এখন চোখে পড়ে। মেলার বিষয় বৈচিত্র্যসহ পরিসরও ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মেলাগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। দেখা যায় জয়পুরহাট জেলার গোপিনাথপুর মেলাতে পূর্বে যে সার্কাস পার্টিগুলো প্রদর্শনীর জন্য আসত বর্তমানে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যাত্রার পালাগুলোতে পরিবর্তন এসেছে। আগে যাত্রার পালাগুলোতে বেহুলাকাহিনি বা গাজীকালু চম্পাবতীদের দেখা যেত কিন্তু এখন তা আর নেই, যোগ হয়েছে তথাকথিত বিনোদন। এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় পূর্বে উট-দুম্বা ক্রয়-বিক্রয় হতো কিন্তু বর্তমান পেক্ষাপটে তা ঘোড়া, গরু-মহিষের মেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশের দই মেলায় দেখা যায় দইয়ের পূর্বের যে স্বাদ সেটি আর নেই। বগুড়ার পোড়াদহের মাছের মেলার ক্ষেত্রে দেখা যায় এটি কেবল নামেরই রূপান্তর হয়েছে। আগে বলা হতো 'সন্ন্যাসী মেলা' এখন বলা হয় 'জামাই মেলা'। সময়ের বিবর্তনে বর্তমান সাংস্কৃতিক চেতনায় পরিবর্তন এসেছে। দেখা যায় মেলার মূল উপলক্ষ্য জামাই। জামাইরা মেলায় এসে মাছ কিনে শ্বশুরবাড়ি যাবে। সে কারণে মেলার নামেরই রূপান্তর ঘটেছে, সন্ন্যাস মেলা থেকে জামাই মেলাতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু ভিন্ন আঙ্গিকের মেলাও দেখা যায়। রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলার পাচঁমাড়িয়া গ্রামে একটি পাখির মেলা বসে। এ মেলাতে আনা হয় জানা-অজানা নানারকম পাখি। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে। কেউ আসে কিনতে কেউবা আসে বেচতে। যাত্রাপালাগুলোতে পূর্বে নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করত, কিন্তু বর্তমানে নারীরাই অভিনয় করে নারী চরিত্রে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে যতীন সরকার বলেছেন :

> যাত্রাজগতে কাহিনি, বক্তব্যে ও রূপরীতির সকল ক্ষেত্রেই একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। বর্তমানে মেলাকেন্দ্রিক যাত্রাগুলো লালসা উদ্দীপক নৃত্যগীতের ওপর ভর করে অপসংস্কৃতির প্রসারেই নিয়োজিত। (যতীন, ২০১৭ : ২৩৯)

রূপান্তরের মধ্য দিয়েও মেলাগুলো আজও টিকে আছে। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় এখনও ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তিমূলক স্থানে মেলার উৎসব হয়। যা আমাদেরকে পিছনে ফিরে তাকাতে সাহায্যে করতে পারে, এভাবেই গড়ে উঠতে পারে দেশাত্মবোধ।

সহায়কপঞ্জি

আনসারুল ইসলাম (২০০৫)। 'প্রসঙ্গ : মেলা' । *ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। ঠাকুরগাঁও।

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯৯৮)। 'বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকমেলা ও উৎসব'। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*। রাজশাহী।

মোকারম হোসেন (২০১৪)। *বাংলাদেশের মেলা*। অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

যতীন সরকার (২০১৭)। *বাংলা'র লোকসংস্কৃতি*। আত্মজা পাবলিশার্স, কলকাতা।

শামসুজ্জামান খান (২০১৪)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : বগুড়া*। সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুনীতকুমার মুখোপ্যাধায় (১৯৯৭)। *মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য*। কলকাতা।